Released 31-8-1940
ডাক্তার
নিউ থিয়েটার্সের চিত্র-নিবেদন
NEW THEATRES LIMITED

নিউ থিয়েটার্সের নূতন চিত্র

ডাক্তার

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
রচিত কাহিনী অবলম্বনে
—চিত্রিত—

নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড্ ঃ কলিকাতা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গান :—"কি পাইনি তারি হিসাব মিলাতে"...

সংগঠণকারী

পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার ...	ফণী মজুমদার
গান	রবীন্দ্রনাথ
	অজয় কুমার ভট্টাচার্য্য
চিত্র-শিল্পী	ইউসুফ মুলজী
শব্দ-যন্ত্রী	লোকেন বসু
সুর-শিল্পী	পঙ্কজ মল্লিক
সম্পাদক	হরিদাস মহলানবীশ
রসায়নাগারাধ্যক্ষ ...	সুবোধ গাঙ্গুলী
ইউনিট ব্যবস্থাপক	জলু বড়াল
তত্ত্বাবধায়ক	পি, এন, রায়

সহকারীগণ

পরিচালনায় ...	কার্ত্তিক চ্যাটার্জ্জি, চন্দ্রশেখর বসু
চিত্র-শিল্পে ...	অমূল্য মুখার্জ্জি, কেষ্ট হালদার, প্রভাকর হালদার
শব্দানুলেখনে ...	অরবিন্দ চ্যাটার্জ্জি, রণজিৎ দত্ত, সুশীল সরকার
সঙ্গীত-পরিচালনায় ...	তারক দে, বীরেন বল
মঞ্চ-শিল্পে ...	পুলিন ঘোষ
দৃশ্য-সজ্জায় ...	অনাথ মৈত্র
ব্যবস্থাপনায় ...	সুধীর ভট্টাচার্য্য

রেলওয়ে দৃশ্যাদি ই-বি-আর এবং রসায়নাগার-দৃশ্যাদি বেঙ্গল কেমিক্যাল্ অ্যাণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্ লিমিটেডের সৌজন্যে গৃহীত

ভূমিকা-লিপি

সীতানাথ	...	...	অহীন্দ্র চৌধুরী
অমরনাথ	...	...	পঙ্কজ মল্লিক
সোমনাথ	...	...	জ্যোতিপ্রকাশ
দয়াল	...	...	অমর মল্লিক
অক্ষয়	...	...	শৈলেন চৌধুরী
শিরোমণি	...	...	ইন্দু মুখোপাধ্যায়
তপন	...	...	বুদ্ধদেব
মায়া	...	...	পান্না
শিবাণী	...	...	ভারতী

টোনা রায়, বোকেন চট্টো, অরবিন্দ সেন, নরেশ বসু, অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, কেনারাম মুখার্জ্জি, কানু বন্দ্যো, সুকুমার পাল, বীরেন দাস, দ্বিজেন গাঙ্গুলী, এম. এম, ভট্টাচার্য্য, হরিমোহন বসু, ধ্রুব চক্রবর্ত্তী, কমলা, ও হরি সুন্দরী

কাহিনী

[রায়ধাম। অতি প্রাচীনগ্রাম। স্বর্গীয় রাজা ধীরেশ নাথ রায়চৌধুরী এই গ্রাম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ সীতানাথ রায়চৌধুরী এই সুপ্রাচীন রায় বংশের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। সংরক্ষণশীল সধর্ম্মনিষ্ঠ তেজস্বী ব্রাহ্মণ।

তাঁহারই পুত্র অমরনাথ। চরিত্রবলে, মনের দৃঢ়তায় পিতার মতই উন্নত। কিন্তু যুগধর্ম্মের প্রভাবে উভয়ের আদর্শ ও চিন্তাধারা ছিল পরস্পর বিরোধী।

স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত অমরনাথ দেশ হইতে মহামারী তাড়াইবার সঙ্কল্প লইয়া মেডিকেল কলেজে পড়িতে গিয়াছিল।

ধর্ম্মের ও জাতের গোঁড়ামি এবং আভিজাত্যের বড়াই দিয়া মানুষ পরস্পরের মধ্যে যে গণ্ডী সৃষ্টি করিয়াছে অমরনাথ সে গণ্ডীকে স্বীকার করিত না। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সেবা — দাতব্যচিকিৎসালয়-সংগঠণ প্রভৃতি জনসেবার কার্য্য লইয়া সে সর্ব্বদা মাতিয়া থাকিত।

কাজেই আভিজাত্যাভিমানী ব্রাহ্মণ জমিদার দেখিতেন ম্লেচ্ছভাবাপন্ন পুত্র বংশের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতেছে। তথাপি শৈশবে মাতৃহীন পুত্রের প্রতি মমতা বশতঃ তিনি কঠোর হইতে পারিতেন না এবং ইহার জন্য তাঁহার রাগ পড়িত গিয়া খাস চাকর দয়ালের উপর। দয়ালের অপরাধ — সে স্নেহান্ধ। সে মাতৃহারা অমরনাথকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে।

অমরনাথও জানিত তাহার কার্য্যে সংরক্ষণশীল পিতা অত্যন্ত আঘাত পান। পিতার প্রতি তাহার ছিল অগাধ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। তাই নিজের আদর্শ অনুযায়ী চলিলেও চপল সারল্যের মাধুর্য্য দিয়া পিতার বিক্ষুব্ধ অন্তঃকরণে সর্ব্বদাই সে প্রলেপ দিবার চেষ্টা করিত।

তাই এতদিন বিভিন্ন······এই দু'টি পুরুষের জীবনে কোন সংঘর্ষ ঘনাইয়া উঠিবার সুযোগ পায় নাই।]

লাইট রেলওয়ের যে লাইনটি বাড়ীর আনাচ-কানাচ দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া গ্রামের সকলের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতাইয়া চলিয়া গিয়াছে—সেই দেড়হাত প্রস্থের লাইনটিই সুদূর পল্লী রায়ধামকে সহরের সঙ্গে সংযুক্ত রাখিয়াছিল।

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এক শুভদিনে, কর্ম্মপাগল যুবক অমরনাথ, মেডিকেল কলেজে ফাইনাল পরীক্ষা দিয়া এই ট্রেনে বাড়ী ফিরিতেছিল। শক্তিমান, প্রাণের প্রাচুর্য্যে ভরপুর যুবক, গাড়ীর হাতল ধরিয়া হাসি ও গানে গ্রামের আবালবৃদ্ধ সকলকে আনন্দে মাতাইয়া গ্রামে ফিরিতেছে। গত বৎসর অর্দ্ধেক গ্রাম কলেরায় উজাড় হইয়া গিয়াছে। এবার এই মহামারীকে সে গ্রামে প্রবেশ করিতে দিবে না। তাই উহাকে প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে।

রায়ধাম ষ্টেশনে অমরনাথের সহকর্ম্মীরা তাহার অপেক্ষায় ভিড় করিয়া রহিয়াছে। বৃদ্ধ দয়াল তাহার জন্য পাল্কী লইয়া আসিয়াছে।

অমরনাথ পৌছিয়াই শুনিল গ্রামে কলেরা দেখা দিয়াছে এবং সেই ভয়ে সমস্ত গ্রামবাসী ওলাই-চণ্ডীতলায় পূজার ব্যবস্থা করিয়াছে।

বাড়ী না ফিরিয়াই অমরনাথ ছুটিল ওলাইচণ্ডীতলা। শিরোমণি প্রভৃতি গ্রামের সকলেই সেখানে উপস্থিত। ওলা-দেবীকে পূজা দিয়া সন্তুষ্ট করিবার মানসে গ্রামময় কলেরা ছড়াইয়া দিবার সব রকম ব্যবস্থাই সেখানে আছে। আরও দেখিল—বেণী চক্রবর্ত্তীর যুবতী কন্যা মায়া একটু নির্ম্মাল্য, একটু চরণামৃতের জন্য ব্রাহ্মণদের পায়ে মাথা খুঁড়িতেছে। তাহার পিতার কলেরা হইয়াছে। সমাজ-পতিতা এই কন্যার স্পর্দ্ধা দেখিয়া শিরোমণির দল আস্ফালন করিতেছেন।

মায়ার অপরাধ সে খণ্ড-বিবাহিতা। সামান্য বরপণ কমের জন্য বিবাহের আসর হইতে বর উঠিয়া গিয়াছিল।

অমরনাথ ইহাদের হাত হইতে মায়াকে উদ্ধার করিল। ইহাদের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া বেণীকে দাতব্য চিকিৎসালয়ে পাঠাইয়া দিয়া বাড়ী ফিরিয়াই শুনিল, গ্রামের লোক তাহার আদেশ অমান্য করিয়া পানীয় জলের জন্য সংরক্ষিত দীঘির জল নষ্ট করিতেছে।

কোনরকমে স্নানাহার সারিয়া অমরনাথ ছুটিল তাহা বন্ধ করিতে। তারপর সারাদিন গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইল মহামারী বন্ধ করিবার কাজে। শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে দিনান্তে বাড়ী ফিরিয়া একটু বিশ্রাম করিতে না করিতেই আবার খবর আসিল—বেণী ঠাকুরের শেষ অবস্থা।

অসহায়া কন্যার ভবিষ্যৎ চিন্তায় মৃত্যুপথ-যাত্রী, কাতর হতভাগ্য পিতার শেষ নিঃশ্বাস সহজে ফেলিবার সুযোগ দিল অমরনাথ। স্বেচ্ছায় সে গ্রহণ করিল মায়ার ভার।

এই ঘটনা সীতানাথের কানে উঠিতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু সীতানাথ এ কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। শুধু তাহার মনে হইল পুত্র বিবাহযোগ্য।

পুত্রের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিতে গিয়াই স্নেহশীল পিতা সর্ব্বপ্রথম অন্তরে নিদারুণ আঘাত পাইলেন। পুত্র সবিনয়ে জানাইল—বেণী চক্রবর্ত্তীর অন্তিম কালে তাহার শেষ ইচ্ছা পালন করিতে গিয়া সে মায়াকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছে।

দুই বিপরীত আদর্শে এতদিনে বাধিল সংঘাত। নিষ্ঠাবান সংরক্ষণশীল পিতা, সমাজ-চ্যুত ব্রাহ্মণের খণ্ড-বিবাহিতা কন্যাকে রায়বংশের বধূরূপে গ্রহণ করিতে কখনই পারেন না। বুক ভাঙ্গিয়া গেলেও এই বংশের মর্য্যাদা তাঁহাকেই রাখিতে হইবে। তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া দেখিলেন, তাঁহার একমাত্র বংশধর তাঁহারই হাতে হাত রাখিয়া শপথ করিল, রায়বংশের সন্তান বলিয়া নিজের পরিচয় সে দিবেনা। রায়বংশের নাম-যশ-পদবী-মর্য্যাদা চিরজীবনের মত সে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

অমরনাথ আদর্শবাদী—অমরনাথ কর্ম্মী। যেখানেই সে যাক—জনসেবার কাজে সে আত্মনিয়োগ করিবেই।

আর মায়ার নিকট অমরনাথ শুধু স্বামী নয়—অমরনাথ ত্যাগবীর, দেবতা, মহাপুরুষ। তাহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে গিয়া চিরকৃতজ্ঞ মায়া অতি সহজেই তাহার জনসেবার কাজে আপনাকেও ডুবাইয়া দিল।

রায়ধাম হইতে বহুদূরে একখানি গণ্ড গ্রামে স্বামী-স্ত্রী স্থাপন করিল তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র। গড়িয়া তুলিল ছোট্ট একটি হাসপাতাল—'পল্লী-মঙ্গল সেবা-সদন'।

দিনের পর দিন যায়.........

একদিন তাহাদের ভাবী সন্তান এই পৃথিবীতে তাহার আগমন বার্ত্তা জানাইল। সেই দিন হইতেই স্বামী-স্ত্রীর সমস্ত কল্পনা চলে তাহাদের অনাগত সন্তানকে ঘিরিয়া। তাহাদের ভাবী সন্তান হইবে বিরাট কর্ম্মযোগী—তাহার নিকট তাহারা গ্রহণ করিবে

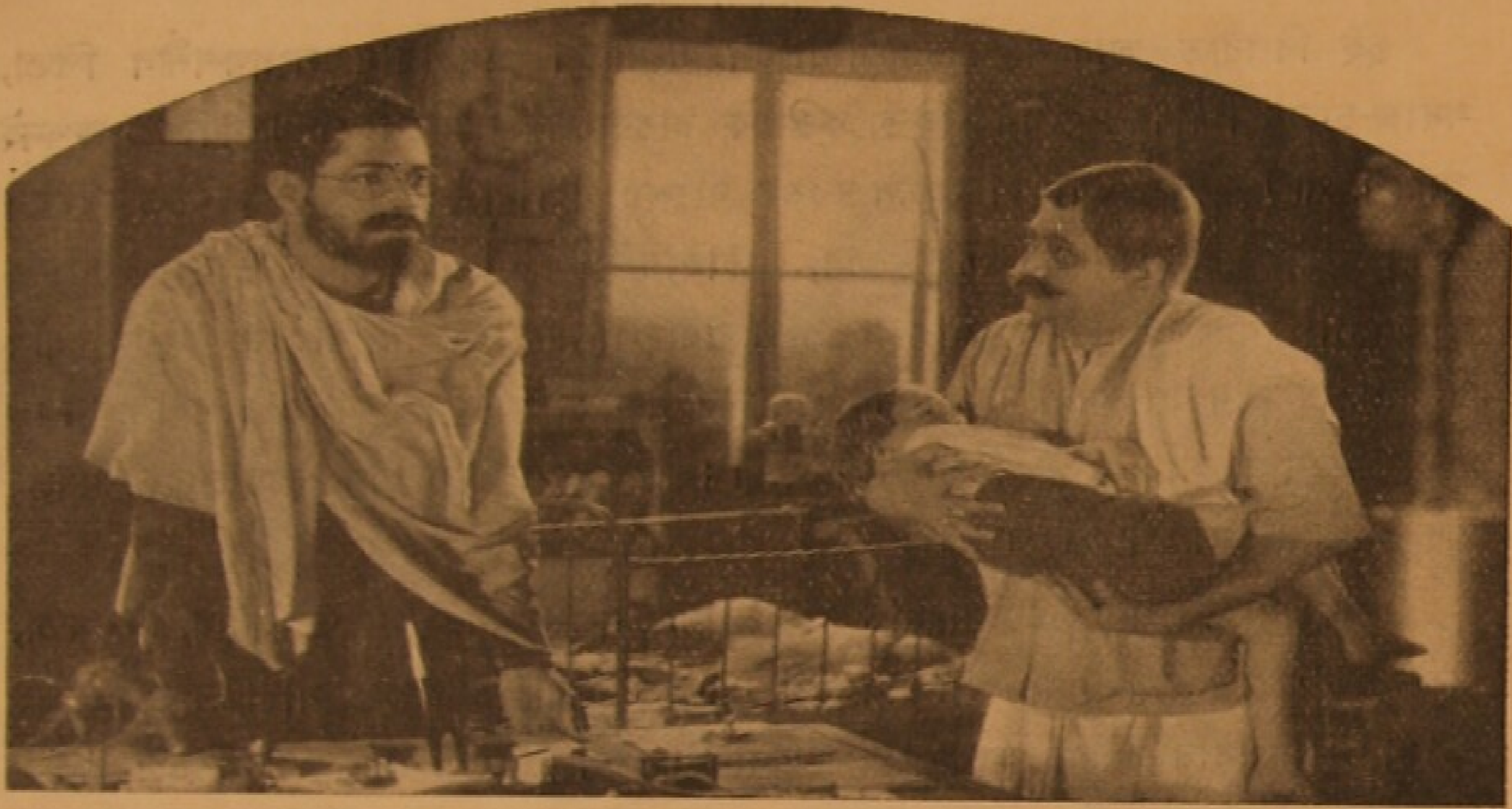

উপদেশ—তাহারই পরিকল্পনা অনুযায়ী, সারা বাংলাদেশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহারা দেশের রোগ তাড়াইয়া বেড়াইবে।

যথা সময়ে মায়া সন্তানের জন্মদিল—কিন্তু নিজে করিল আত্মদান। নিজের জীবনের বিনিময়ে জননী তাহার কল্পনার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিল।

অমরনাথ বাঁচিয়া রহিল মায়ার জীবন-স্বপ্ন সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য। হাসপাতালের নূতন নামকরণ করিল 'মায়া সেবা-সদন'। মায়ার সমাধিক্ষেত্র হইল অমরনাথের বিশ্রামস্থল—মায়াপুরী।

বহুদিন ধরিয়া সন্ধান করিতে করিতে দয়াল একদিন অমরনাথকে আবিষ্কার করিল এই হাসপাতালে। আবিষ্কার করিল বটে, কিন্তু কিছুতেই ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারিল না।

মায়াকে লইয়া পিতা-পুত্রের মধ্যে যে ব্যবধান গড়িয়া উঠিয়াছিল মায়ার মৃত্যু সেই ব্যবধানকে চিরস্থায়ী করিয়া গেল।

দয়াল যখন দেখিল তাহার 'খোকা-বাবু' কিছুতেই গৃহে ফিরিবে না তখন সে নিরুপায় হইয়া তাহার মাতৃহীন পুত্রকে চাহিয়া বসিল। অমরনাথের পিতৃহৃদয়ে নিদারুণ আঘাত দিয়া নির্ম্মম ভাবে দয়াল শুনাইয়া দিল—"তুই মাকে খেয়েছিস, বৌটাকে খেয়েছিস—ছেলেটাকে তুই বাঁচাতে পারবি না খোকা!"

স্নেহ-প্রবণ অন্তরের দুর্ব্বলতা, সংস্কার-মুক্ত মনকেও কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে। দয়ালের কথায় অমরনাথের মন'ও শঙ্কাকুল হইয়া উঠিল। সত্যই যদি সে বাঁচাইতে না পারে! যদি মায়ার স্বপ্ন সফল না হয়!

অবশেষে পিতা তাহার নয়নের মণি, মায়ার স্বপ্নকে, দয়ালের হাতেই তুলিয়া দিল। শুধু তাহাকে দিয়া শপথ করাইয়া লইল, সীতানাথের নিকট বালক সোমনাথের পিতৃপরিচয় গোপন রাখিতে হইবে—তাহাকে বিদেশে পাঠাইয়া উচ্চশিক্ষিত ডাক্তার করিয়া তুলিতে হইবে।

ইহার পর পঁচিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। অমরনাথ আজ বৃদ্ধ। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে, যে যুবক তাহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, অর্থ ও জমি দিয়া নানাভাবে তাহাকে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন, সেই অক্ষয়বাবুও কর্ম্ম-জীবন হইতে অবসর লইয়া কলিকাতাবাসী হইয়াছেন। বৃদ্ধ সীতনাথও অতি বৃদ্ধ। দয়াল স্থবির হইতে চলিয়াছে।

শিশু সোমনাথ এখন পূর্ণ-যুবক। বিদেশ হইতে সে চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে।

অমরনাথ অনেক আশা করিয়া কলিকাতা ছুটিয়া আসিয়াছে। তাহার মায়ার স্বপ্ন বুঝি এতদিনে সফল হয়। বন্ধু অক্ষয় বাবুর বাড়ীতে থাকিয়া সে একান্ত মনে সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছে।

পুত্রের পরিচয় গোপন রাখিয়াই অমরনাথ অক্ষয় বাবু ও তাঁহার কন্যা শিরাণীকে শুনায়—ডাঃ সোমনাথ রায় চৌধুরী এমন একটা কিছু করিবেই যাহাতে দেশের যথার্থ মঙ্গল হয়।

তাই যেদিন অমরনাথ স্বচক্ষে খবরের কাগজে দেখিল সোমনাথ, 'ইণ্ডিয়া কেমিক্যাল্'-এ Bacteriologist-এর কাজ লইয়াছে, সেদিন সে যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সোমনাথের লেবরেটরীতে গিয়া তীব্র তিরস্কারে তাহাকে আক্রমণ করিল। কিন্তু তাহার সেই তীব্রতার মাঝেও রহিয়া রহিয়া প্রকাশ পাইতেছিল—মায়ার আদর্শে সোমনাথকে অনুপ্রাণিত করিবার চেষ্টা ও বহু বৎসরের পিতৃ-স্নেহ-কাতর হৃদয়ের অবরুদ্ধ আবেগ।

তাই সোমনাথের মনে এই অদ্ভুত বৃদ্ধটির দৃষ্টি ও তিরস্কার যেন একটি বিক্ষোভের সৃষ্টি করিল। অমরনাথ চলিয়া যাইবার পর, চিন্তিত সোমনাথ হঠাৎ একসময় বাহির হইয়া পড়িল এই বৃদ্ধকে খুঁজিয়া বাহির করিতে।

বৃদ্ধকে খুঁজিতে গিয়া, তরুণ যুবক সোমনাথ আরও একজনকে খুঁজিয়া পাইল। সে—তন্বী, চঞ্চলা, মুখরা—শিবাণী।

অমরনাথের নিকট সোমনাথ গ্রহণ করিল কর্ম্মদীক্ষা—কিন্তু শিরাণীর নিকট করিল হৃদয়দান।

অমরনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত সোমনাথ চাকরী ছাড়িয়া দিয়া রায়ধামে পল্লী-সেবার উদ্দেশ্যে ঔষধের কারখানা খুলিবার কাজে মাতিয়া উঠিল। তাহার তৈয়ারী

ঔষধে দেশের রোগ দূর হইবে—তাহার কারখানাকে ঘিরিয়া গড়িয়া উঠিবে পল্লীসেবক-সঙ্ঘ। তাহার কারখানা একাধারে হইবে—কারখানা, গবেষণা-মন্দির ও জন-শিক্ষার কেন্দ্র।

সোমনাথ চলিল অমরনাথের কর্ম্মক্ষেত্র দেখিতে। সঙ্গী হইলেন অক্ষয় বাবু, শিবাণী ও তাহার ভাই—তপন।

এখানে সোমনাথ লক্ষ্য করিল কর্ম্মযোগী অমরনাথের অপরিসীম ত্যাগ—কি ভাবে অসংখ্য বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া তিনি সকলের কর্ম্মপথ সুগম করিয়া দিয়াছেন।

আর লক্ষ্য করিল, তাঁহার অপরিমেয় ও আদর্শ পত্নীপ্রেম কি ভাবে এক মহাভাগ্যবতী রমণীর স্মৃতিকে অন্তরে ধরিয়া জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছে!

আনন্দাশ্রুভরা চোখে অমরনাথ লক্ষ্য করিল, তাহার মায়ার ছেলে মায়ার সমাধির পাশে বসিয়া তাহারই স্বপ্ন সফল করিবার সঙ্কল্প করিতেছে। আরও লক্ষ্য করিল, মায়ার সমাধিতেই তাহার একান্ত স্নেহের পাত্রী চপলা শিবাণী, লজ্জানত মুখে সোমনাথকেও যেন ধীরে ধীরে একান্ত আপনার করিয়া লইতেছে!

কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়া সোমনাথ দয়ালকে জানাইল, সে শীঘ্রই শিবাণীকে বিবাহ করিবে। শিবাণীর নাম সে সোমনাথের মুখে পূর্ব্বেও শুনিয়াছে; কিন্তু তাহার কোন বংশপরিচয় কখনও পায় নাই। বরং তাহাকে রাগাইবার জন্য সোমনাথ শিবাণীকে ম্লেচ্ছ, অহিন্দু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে।

সরল-হৃদয় দয়াল তাই স্থির থাকিতে পারিল না—সীতানাথের নিকট গিয়া নালিশ জানাইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বৃদ্ধ প্রশ্ন করিলেন, সোমনাথ শিবাণীর বংশ

গোত্র শ্রেণীর খোঁজ লইয়াছে কিনা। আধুনিক যুবক সোমনাথের নিকট সংরক্ষণশীল বৃদ্ধের নিষ্ঠার কোন মূল্যই নাই। তাহার মতে, এই প্রাচীন মত গুলির বাণপ্রস্থ লইবার সময় হইয়াছে। তাই চলিয়া যাইতে যাইতে হাসিমুখে বলিয়া গেল—সে কাহারও বংশ-গোত্র-শ্রেণী বিবাহ করিবে না – বিবাহ করিবে একটি মেয়েকে।

সীতানাথ এই ধরণের মন্তব্য পূর্ব্বেও সোমনাথের নিকট শুনিয়াছেন এবং ক্ষমাও করিয়াছেন। কিন্তু আজ যেন অসহ্য মনে হইল।

তাই একটু পরে সোমনাথ ফিরিয়া আসিয়া শুনিল, সীতানাথ দয়ালকে বলিতেছেন এই ধরণের উক্তি আঁস্তাকুড় হইতে কুড়াইয়া পাওয়া জীবের মুখেই সম্ভব। স্তব্ধ বিস্ময়ে সোমনাথ শুনিল—সে নামহীন, গোত্রহীন, পরিচয়হীন! দয়াপরবশ হইয়া বৃদ্ধ জমিদার নাকী তাহাকে সন্তান স্নেহে পালন করিয়াছেন মাত্র।

সোমনাথ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সে তো সীতানাথের নিকট দয়া ভিক্ষা করে নাই! সমাজ সে মানে না—জাতি ভেদ সে স্বীকার করে না—কিন্তু এতকাল জমিদার সীতানাথ রায় চৌধুরীর পুত্র বলিয়া যাহাদের কাছে পরিচয় দিয়া আসিয়াছে—নাম গোত্রহীন হইয়া আজ তাহাদের মাঝে দাঁড়াইবে সে কোন মুখে? ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে পাগলের মত সে সীতানাথের বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

বিপদে পড়িল দয়াল। সত্য পরিচয় দিয়া এই সমস্যার সমাধান সে করিতে পারে—কিন্তু সোমনাথকে স্পর্শ করিয়া অমরনাথের নিকট যে শপথ সে করিয়াছে, তাহা সে কি করিয়া ভঙ্গ করিবে ?

ঊর্দ্ধশ্বাসে দয়াল বাহির হইয়া পড়িল মায়া-সেবাসদনের উদ্দেশ্যে। অমরনাথের নিকট কাঁদিয়া পড়িল, "তোর দিব্বি ফিরিয়ে নে খোকা—ছেলেটার সর্ব্বনাশ করিস না।"

মহা সমস্যা আজ অমরনাথের সম্মুখীন। পিতার পাদস্পর্শ করিয়া যে শপথ সে করিয়াছে—আত্মপ্রকাশ করিলে সে শপথ ভঙ্গ হয়—মায়ার স্মৃতির হয় অপমান!

কিন্তু আত্মপ্রকাশ না করিলেও সোমনাথকে ফিরিয়া পাওয়া অসম্ভব। মায়ার স্বপ্নকে সফল করিবার জন্যই সে এতকাল বাঁচিয়া রহিয়াছে—আজ সাফল্যের কিনারে আনিয়া সে-স্বপ্নকে সে নষ্ট হইতে দিতে পারে না।

অমরনাথ কি আত্মপ্রকাশ করিবে ?

শিবাণীর সঙ্গে সোমনাথের মিলন কি অসম্ভব ? ক্ষোভে দুঃখে অপমানে সোমনাথ আত্মহত্যা করিয়া বসিবে না তো ?

পুত্র-শোকাতুর বৃদ্ধ সীতানাথ এই আঘাত সহ্য করিতে পারিবেন কি ? যে পুত্র জমিদার সীতানাথের আদর্শ চূরমার করিয়া চলিয়া গিয়াছে—স্নেহশীল পিতা গোপনে যে সেই-পুত্রের আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছেন দিনের পর দিন—সে কি আর ফিরিয়া আসিবে না ?

মায়ার স্বপ্ন কি অসম্পূর্ণই রহিয়া যাইবে ?

—সঙ্গীতাংশ—

—এক—

(গান) এই বয়সের এই আমি
এ-বয়সেই থাকবো,
হঠাৎ খুসির এই হাওয়া
চিরদিনই রাখবো।
জমবে ধুলো পথ-চলায়
রইবে যে রং তার তলায়
সারা জীবন সেই রঙে
এম্নি ছবিই আঁকবো।

(ছড়া) শ্যাকরাদের ছ্যাক্‌রা গাড়ি
চলছে শুধু, যাচ্ছে না
বস্তা মুখো মস্ত হাতি
পিপড়ে তারে মারছে লাথি
মারছে গায়ে, লাগছে না।

(গান) আজ রামের অধিবাস
কাল রামের বিয়ে
ঘরে আসবে হাসি মুখে
সোনার সীতা নিয়ে।

(ছড়া) বৌদি আমার বৌদি গো।
(তোমার) শ্যামের কথা আছে জানা
কইনি আজো কইনি গো।

আস্থি কালের বস্থি বুড়ি
সর্দি ঝরে নাক দিয়ে
তিড়িং তিড়িং ফড়িং যেন
নাচে পিড়িং পাক দিয়ে।

(গান) যে নাম লয়ে আজ এলাম
আমি শুধু সেই তো,
আর পরিচয় নেই তো;
শূন্য আমি শূন্য রে
ধন্য যে তাই ধন্য রে
পূর্ণ হবার জয় গানে
শূন্যতা মোর ঢাকবো।
এই বয়সের এই আমি
এ বয়সেই থাকবো।

—অজয় ভট্টাচার্য্য।

—দুই—

ওরে চঞ্চল,
এই পথে এই যাওয়া
এই সুরে এই গাওয়া

শেষ নয় শেষ নয়
সে কথাটি বল (ওরে চঞ্চল)।

হেথা তুই চির চেনা
এই ঘাটে লেনা-দেনা
ফুরাবে না ফুরাবে না,
শুধু চলাচল (ওরে চঞ্চল)।

স্বপ্নের কবি রে,
ধরণীর পথে পথে এঁকে গেলি ছবি রে
স্বপ্নের ছবিরে—
(স্বপ্নের কবি রে)

যেথা তুই হবি হারা
সেথা সুরু নহে সারা
তৃণে তৃণে তোরি প্রাণ
বীণে বীণে তোরই গান
'নাই' মাঝে চির থাকা
ছেড়ে দিয়ে চির রাখা
রে অতীত, অনাগতে হবি উজ্জ্বল
(ওরে চঞ্চল)।

—অজয় ভট্টাচার্য্য।

—তিন—

যবে, কণ্টক পথে হবে রক্তিম পদতল
অন্তরে ফুটিবে যে সুন্দর শতদল,

দুঃখের লিপিলেখা বিচ্ছেদ কালিমায়
উজ্জ্বল হবে জানি মিলনের চাঁদিমায়,
বন্ধন মাঝে মোর মুক্তির কোলাহল।
রাত্রি এ নয় কভু যাত্রীরে কিবা ভয়
হৃদয়ের স্তরে তার দিবসের বিভা রয়
রিক্ত এ তরুপ্রাণে ফাল্গুন ছল ছল।

* * * * *

নিশীথের দুখস্মৃতি প্রভাতের গীতি হয়,
বেদনার অশ্রু যে বেদনার গাহে জয়,
ঝঞ্ঝার পাশে ওই
কল্যাণ আসে ওই
হলাহল পাত্র যে সুধারসে টলমল।

—অজয় ভট্টাচার্য্য।

—চার—

চৈত্রদিনের ঝরাপাতার পথে
দিনগুলি মোর কোথায় গেল
বেলাশেষের শেষ আলোকের রথে।
নিয়ে গেল কতই আলো কতই ছায়া
নিলো কানে কানে ডাকা নামের
মনে মনে রাখা মায়া,
নিয়ে গেলো বসন্ত সে
আমার ভাঙ্গা কুঞ্জশাখা হ'তে।

দূরে দূরে কোথায় আমার স্বপনখানি
কয়ে বেড়ায় এই তো আমি
প্রাণে প্রাণে চিরদিনের জানাজানি
কোথায় আমার নয়ন আলো
কোন প্রদীপের আলোর সনে
কেমন করে সে মিলালো !
আবার সে কোন সুদূর বিপুল নভে
অস্তপারের দিনগুলি মোর
নূতন উষার মালা হয়ে রবে,
আমায় ওরা চিনবে না গো
চিনবোনা আর আমি কোন মতে।
—অজয় ভট্টাচার্য্য।

—পাঁচ—

সেদিন শুধালো বাঁশি
কে দিল আমায় সুর ?
নীরব রহিল ফুল
চাঁদ চলে গেল দূর।
কবি তবে কহে গানে
কহে বাঁশরির কানে
মোর সুর লয়ে তুমি
সুরে সুরে ভরপুর।
—অজয় ভট্টাচার্য্য।

—ছয়—

আমি বন-বুলবুল
গাহি গান আমি রে,
ছলছল নদী জল
বহি দিন যামী রে।
আমি ঘুম নিঃঝুম
দিয়ে যাই চোখে চুম
আলো হয়ে জলে উঠি
ছায়া সম নামি রে
বাসরের ঘরে আমি
প্রণয়ের গুণ গুণ
উদাসীর ভাঙ্গা মন
রাঙ্গা হয়ে করি গুণ
ধরিতে যে আসে মোরে
ধরা দেয় মোর ডোরে
নিয়ে যেতে মোরে হায়
সে তো রয় থামিরে।
—অজয় ভট্টাচার্য্য।

—সাত—

এনাম আমার তার বেণুতে
বাজলো অই
নয় সে কাছে নয় সে দূরে
জানিস্ যদি বলনা কই।
—অজয় ভট্টাচার্য্য।

—আট—

কী পাইনি তারি হিসাব মিলাতে
মন মোর নহে রাজি।
আজ হৃদয়ের ছায়াতে আলোতে
বাঁশরী উঠেছে বাজি'।
ভালবেসেছিনু এই ধরণীরে
সেই স্মৃতি মনে আসে ফিরে ফিরে,
কত বসন্তে দখিন সমীরে
ভরেছে আমারি সাজি॥
নয়নের জল গভীর গহনে
আছে হৃদয়ের স্তরে।
বেদনার রসে গোপনে গোপনে
সাধনা সফল করে।
মাঝে মাঝে বটে ছিঁড়েছিল তার
তাই নিয়ে কেবা করে হাহাকার,
সুর তবু লেগেছিল বারে বার
মনে পড়ে তাই আজি॥
—রবীন্দ্রনাথ।

———

১৭২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, নিউ থিয়েটার্সের পক্ষ হইতে
শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ও
জি, সি, রায় কর্ত্তৃক ৮৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
জুভেনাইল আর্ট প্রেস হইতে মুদ্রিত।